Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual
Peer Reviewed (Double Blind Referred)
Bi-Annual Research e-Journal

Volume-5 Issue-1 July 2026
International e-ISSN 2583-6706
Website
santiniketansahityapath.org.in

INDEXED IN INTERNET ARCHIVE | GOOGLE SCHOLAR | ORCID | SCRIBD | ACADEMIA

DOI https://doi.org/10.67841/pgp.260501035

OPEN ACCESS

IIFS Impact Factor 3.75

SJIF Impact Factor 3.481

Poet Vijay Gupta's 'Padmapuran': Folk Perspectives
কবি বিজয়গুপ্তের 'পদ্মাপুরাণ': লোকায়ত প্রসঙ্গ

Nityananda Basak
Former Student
Bengali Department
Visva-Bharati

Received on: 30th April 2026
Accepted on: 18th May 2026

Abstract:
The 'Manasamangal' constitutes a particularly significant branch within the history of medieval Bengali Mangalkavya. One of the most eminent poets of this tradition is Bijay Gupta. His poetic work is titled 'Padmapuran'. In his poetry, the folk life prevalent in the society of that era is depicted with striking realism. No aspect — be it birth, death, marriage, auspicious and inauspicious omens, or folk rituals surrounding pregnant women — has been omitted from the poet's work.

Key Words:
Well-being, Folk Customs, Society, Folk Life.

মূল প্রবন্ধ

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যধারার একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হলো মঙ্গলকাব্য। "খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীতে কবি ভারতচন্দ্রের কাল পর্য্যন্ত বঙ্গ সাহিত্যে যে বিশেষ একপ্রকার সাম্প্রদায়িক (sectarian) সাহিত্য প্রচলিত ছিল তাহাই বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাসে মঙ্গল-কাব্য নামে পরিচিত।"[১] এক কথায় এই সাহিত্য লৌকিক দেব-দেবীর মাহাত্ম্যমূলক আখ্যান কাব্য। এই মঙ্গলকাব্য ধারায় আমরা বিভিন্ন কাব্যকে পাই — 'মনসামঙ্গল', 'চণ্ডীমঙ্গল', 'ধর্মমঙ্গল', 'অন্নদামঙ্গল' ইত্যাদি। তবে এই ধারার প্রাচীনতম কাব্য হলো 'মনসামঙ্গল' কাব্য। 'মনসামঙ্গল' কাব্যের কবি হিসাবে বাংলা সাহিত্যে আমরা বিভিন্ন নাম পাই, যেমন — আদি কবি হরিদত্ত, নারায়ণ দেব, বিজয়গুপ্ত, বিপ্রদাস পিপলাই, ক্ষেমানন্দ, জীবন মৈত্র প্রমুখ আরো অনেকে। এখন মূলত আমরা 'মনসামঙ্গল' কাব্য ধারার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি বিজয়গুপ্তকে নিয়ে চর্চা করবো। বিজয়গুপ্তের কাব্যের নাম 'পদ্মাপুরাণ'। কবি তাঁর কাব্যকে পুরাণের আদলে নামকরণ করেছেন। ফলে এই কাব্যে যেমন আমরা একদিকে পুরাণের নানা প্রসঙ্গ পেয়েছি, তেমনি পেয়েছি মধ্যযুগীয় বাংলার লোকায়ত জীবন প্রসঙ্গ। 'বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা' গ্রন্থের প্রণেতা ভূদেব চৌধুরী মহাশয় বলেছেন: মঙ্গলসাহিত্য তথা 'মঙ্গল' নামধেয় কাব্যগোষ্ঠীর অন্তর্গত রচনাবলি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের এক স্বতন্ত্র ঐতিহাসিক সম্পদ। প্রাচীনকাল থেকেই বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা একাধিক প্রভাবে পুষ্ট। এই বিচারে মঙ্গলকাব্য গ্রন্থাবলিকে বাংলার মাটির ধন বলে অভিহিত করা যেতে পারে। আলোচ্য শ্রেণির কাব্য-সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ বাংলার লোক-জীবনের জন্ম ও বিবর্তন-ধারার সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িত হয়ে আছে।[২] কাব্যে পঙক্তির পর পঙক্তি জুড়ে রয়েছে এই লোকজীবন বা লোকায়ত জীবন প্রসঙ্গ।

এখন প্রশ্ন লোকায়ত জীবন কী? গ্রামের সাধারণ মানুষেরা যেসকল আচার-আচরণ, রীতি-নীতির দ্বারা সমবেত ভাবে আনন্দে থাকে এবং জীবন অতিবাহিত করে, তাই-ই লোকায়ত জীবন। এই আচার-আচরণ, রীতি-নীতির মধ্যে রয়েছে — জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ,

© Santiniketan Sahityapath

পূজা-পার্বণ, শুভকাজে যাত্রা ইত্যাদি সংক্রান্ত নানা বিশ্বাস সংস্কার। মঙ্গলকাব্যগুলি যেহেতু বাংলার নিজস্ব মাটির সম্পদ, সেহেতু মঙ্গালকাব্যগুলিতে বাংলার লোকায়ত জীবনের প্রসঙ্গা উঠে আসবে এটা স্বাভাবিক। আমাদের আলোচ্য বিজয়গুপ্তের 'পদ্মাপুরাণ' কাব্যও এর ব্যতিক্রম নয়। কাব্যে জন্ম, বিবাহ, মৃত্যু, শুভকাজে যাত্রা, পূজার্চনা ইত্যাদি বিষয়ক নানা চিত্র উঠে এসেছে। এখন সূত্রাকারে সেগুলি নিয়ে আলোচনা করা যাক।

আমাদের সমাজে জন্ম-সম্বন্ধীয় নানা লোকাচার ও লোকবিশ্বাস প্রচলিত রয়েছে। এই লোকাচার বা লোকবিশ্বাস দুই ধরণের। সন্তান যখন মায়ের গর্ভে থাকে তখন সেই গর্ভধারিণীকে কেন্দ্র করে সমাজে নানা মাঙ্গালিক ক্রিয়াকর্ম সম্পাদন করা হয়। যেমন — পঞ্চমাসে পঞ্চামৃত খাওয়ানো হয়, সাত মাসে সাধ খাওয়ানো হয়। বিজয়গুপ্তের কাব্য আজ থেকে বহু বছর আগে রচিত হলেও সেই সমাজেও এই লোকাচার বা মাঙ্গালিক ক্রিয়াকর্মের রীতি প্রচলিত ছিল। লখিন্দর যখন সনকার গর্ভে, তখন পঞ্চমাস হলে সোমাই পন্ডিত সনকাকে বলে —

"সোমাই পন্ডিত বলে সোনেকা গো মাও।
পঞ্চমাস হইল তোমার পঞ্চামৃত খাও।।"৩

(ডিঙ্গা বুড়ান, লখিন্দরের জন্ম ও চান্দ লাঞ্ছনা পালা)

অর্থাৎ এর থেকে পরিষ্কার হয় তৎকালীন সমাজে গর্ভবতী নারীকে পঞ্চামৃত খাওয়ানো হতো — যা আজকের সমাজেও চলমান। এরপর কাব্যে দেখা যায় সনকার যখন সাতমাস তখন সাধ খাওয়ানোর প্রসঙ্গা রয়েছে। সাধ খাওয়ানোর অনুষ্ঠানে মূলত গর্ভবতী নারীকে তার পছন্দমতো নানা খাদ্যদ্রব্য খাওয়ানো হয়। এই কাব্যেও সেই চিত্রের ব্যতিক্রম হয়নি। সনকার গর্ভের সাত মাস সময়ে ধাই সনকাকে জিজ্ঞাসা করে, তার কী খেতে ইচ্ছা করছে? উত্তরে সনকা বলেন —

"সোনা বলে ওগো ধাই কি কহিব কথা।
আনিয়া গাছিক শাক দেও লতাপাতা।।"৪

(ডিঙ্গা বুড়ান, লখিন্দরের জন্ম ও চান্দ লাঞ্ছনা পালা)

এরপর বিভিন্ন শাক নিয়ে আসা হয়। তারপর শুরু হয় রন্ধন-কর্ম। তবে রান্না চাপানোর পূর্বে করা হলো জবা ফুল দিয়ে অগ্নির পূজা। আজো অনেক সমাজে বড়ো কোনো অনুষ্ঠানে রান্নার পূর্বে অগ্নিদেবতার উদ্দেশ্যে ধান-দুর্বা অর্পণ করা হয়। কাব্যে অগ্নির পূজা করার পর শুধু হয় রন্ধন প্রক্রিয়া। রান্না করা হয় — নারকেল কোরা দিয়ে মুগের ডাল, গিমা শাক, দু-তিন রকমের পায়েস, বিভিন্ন রকমের মাছ। মাছ দিয়ে রান্না করা হয় বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য —

"মৎস্য মাংস কাটিয়া করিল ভাগ ভাগ।
রোহিত মৎস্য দিয়া রান্ধে কলতার আগ।।
খান খান করিয়া কাটিয়া লইল চই।
ঝাঁজ কটু তৈলে রান্ধে বাইন মৎস্যের খই।।
চেঙ্গা মৎস্য দিয়া রান্ধে মিঠা আমের বৌল।
কলার মূল দিয়া রান্ধে পিপলিয়া শৌল।।
কৈ মৎস্য দিয়া রান্ধে মরিচের ঝোল।
জিরা মরিচে রান্ধে চিথলের কোল।।
উৎপল মৎস্য আনিয়া তার কাঁটা করে দূর।
গোল মরিচে রান্ধে উপলের পূর।।
আনিয়া ইলিশ মংস্য করিল ফালা।
তাহা দিয়া রান্ধে ব্যঞ্জন দক্ষিণ সাগর কলা।।... "৫

(ডিঙ্গা বুড়ান, লখিন্দরের জন্ম ও চান্দ লাঞ্ছনা পালা)

এছাড়াও শোল, মাগুর মাছের প্রসঙ্গাও পাই। আজকের দিনেও এই চিত্র খুব পরিবর্তিত হয় নি। আজও গ্রামাঞ্চলে সাধের অনুষ্ঠান খুব ধুমধাম করে সম্পন্ন করা হয়।

© Santiniketan Sahityapath

এরপর যখন সন্তান প্রসব হয়, তখন শুরু হয় শিশুকে কেন্দ্র করে নানা লোকাচার-মাঙ্গলিক ক্রিয়াকর্ম। দশ মাসে সনকা পুত্র সন্তানের জন্ম দিলেন। সন্তানের জন্ম হওয়ার পর ছয় দিনে ষষ্ঠী পূজা এবং নিশি জাগরণ আজো সমাজে বর্তমান। কাব্যেও সেই চিত্র পরিলক্ষিত হয়। এরপর আসে লখিন্দরের অন্নপ্রাশনের প্রসঙ্গ। লখিন্দরের যখন ছয় মাস বয়স, তখন তার অন্নপ্রাশনের ব্যবস্থা করা হয় —

"ছয়মাস যখনেতে হইল কুমার।
অন্নপ্রাশন জন্য দ্বিজ আনিল বিস্তর ।।
সংবাদ দিয়া আনিলেক সোমাই ব্রাহ্মণ।
শুভক্ষণে করিলেক অন্ন আরম্ভন।।"[৬]

(ডিঙ্গা বুড়ান, লখিন্দরের জন্ম ও চান্দ লাঞ্ছনা পালা)

এরপর লখিন্দরের বয়স সাত বছর হলে শুভদিনে কর্ণভেদ করা হয়। তারপর শুভদিনে শুরু হয় লখিন্দরের বিদ্যা গ্রহণের হাতেখড়ি।

বিজয়গুপ্তের কাব্যে বিবাহ সম্পর্কীত নানা লোকাচার ও লোকবিশ্বাসের প্রসঙ্গ রয়েছে মনসার বিবাহ ও বেহুলা-লখিন্দরের বিবাহকে কেন্দ্র করে। যেমন বিবাহে এয়োরা মঙ্গল গাইতে আসে, তেল সিঁদুরের প্রয়োজন হয়। বিবাহে নানা বাদ্যযন্ত্রের প্রসঙ্গও রয়েছে, মঙ্গল স্নানের কথা আছে, "মঙ্গল স্নান করাইতে নারীর হুড়াহুড়ি।"[৭] পাশাপাশি বিবাহে ক্ষৌরকর্মের প্রসঙ্গও বিজয়গুপ্তের কাব্যে পাই —

"জয় জয় হুলাহুলি মঙ্গল বাদ্যগীত।
করিল ক্ষৌরকর্ম দেবের নাপিত।।"[৮]

(মনসা বিবাহ পালা)

এরপর মনসাকে বিবাহ সাজে সজ্জিত করার প্রসঙ্গ রয়েছে —

"ধূপের ধোঁয়া দিয়া সে বাসিত করে কেশ।।
সুবর্ণের কর্ণফুল কর্ণে আনি দিল।
নাকেতে বেশর দিল করে ঝলমল।।
গলায় হার দিলো সুবর্ণের পাঁতি।
মধ্যে মধ্যে লাগাইয়াছে সুবর্ণের তথি।।... "[৯]

(মনসা বিবাহ পালা)

এরপর বিবাহ আসরে মনসা স্বামীকে সাতবার প্রদক্ষিণ করেন। শাস্ত্রমতে মন্ত্রপাঠ করে হোম করা হয়। এইভাবে বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পর মনসা বাসর ঘরে প্রবেশ করে। এইসব নানা লোকাচার ছাড়াও বিবাহে আরো কিছু মেয়েলি খেলার প্রসঙ্গ লক্ষ করা যায় যা আগেও ছিল এবং আজো বহমান। যেমন — 'লখিন্দর বিবাহ পালা'য় বেহুলা-লখিন্দরের বিবাহ বাসরে নানা রকম মেয়েলি খেলার প্রসঙ্গ পাই। যেমন — 'নিছাল খেলায়', 'নানা সর্পে গারুড়ী খেলায়'। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক অচিন্ত্য বিশ্বাস জানিয়েছেন — "বেহুলা-লখিন্দর বিবাহ বাসরে 'নিছলি খেলায়' বলে জানিয়েছেন কবি। চালের পাত্রে গুয়া রেখে খুঁজে বের করার খেলা এটি। কখনো কড়িও ব্যবহার করা হয়। মেয়েলি খেলাটি এখনো অপ্রচলিত হয়নি। আরেকটি খেলার কথা লিখেছেন বিজয়গুপ্ত। তাঁর ভাষা 'নানা সর্পে গারুড়ী খেলায়।' আমাদের ধারণা এ খেলা সাপ-লুডো জাতীয়।"[১০] তৎকালীন সমাজের বিবাহ সম্পর্কিত এইসব লোকাচার বিজয় গুপ্তের কাব্যে উঠে এসেছে — যা আজকের সমাজ থেকে খুব একটা আলাদা ছিল না।

এখন কাব্যে চিত্রিত মৃত্যু সংক্রান্ত লোকাচার বা লোকবিশ্বাসের প্রসঙ্গে দৃষ্টিপাত করবো। মনসামঙ্গল কাব্যে 'ধন্বন্তরি বধ পালা'য় ধন্বন্তরির সর্পাঘাতে মৃত্যু ঘটলে দেখা যায় তাঁর কনিষ্ঠ আঙুল কেটে উত্তরদিকের ভূমিতে পুঁতে দেওয়া হয়। এর ফলে নাকি উত্তরদিকে বাতাস দিলে সাপেরা মাথা তুলতে পারে না — এই লোকবিশ্বাস তখনো বর্তমান ছিল, আজো অনেকে বিশ্বাস করেন। সাপের দংশনে বা সর্পাঘাতে মৃত্যু হলে কোনো মানুষকে আগুনে দাহ করা হতো না। সেই চিত্র কাব্যে উঠে এসেছে 'ছয় কুমার বধ পালা' এবং 'লখিন্দর দংশন পালা'য়। 'ছয় কুমার বধ পালা'য় দেখা যায় ছয় কুমার মারা গেলে সোমাই পণ্ডিত বলেন —

© Santiniketan Sahityapath

"প্রাচীন লোকের মুখে হেন কথা শুনি।
মরিলে নাগের ঘায় না পোড়ে আগুনি।।
স্রোতে ভাসাইয়া দাও যথা তথা যায়।
দৈবগতি গারুড়িয়া যদি লাগ পায়।।"[১১]

(ছয় কুমার বধ পালা)

'লখিন্দর দংশন পালা' তেও একই চিত্র পরিলক্ষিত হয়। বাসর ঘরে সর্পাঘাতে লখিন্দরের মৃত্যু হলে চাঁদ বলেন — 'গাঙ্গুড়ির কূলে নিয়া পোড় লক্ষ্মীন্দর।'[১২] একথা শুনে বেহুলা তখন বলেন —

"পূর্বকালের কথা ধর কহিয়াছে বুড়াবুড়ি।
সর্পঘাতে মৈলে লোকে অগ্নিতে না পুড়ি।।
কলার মাজুষে করি ভাসাও গাঙ্গাড়ি।
আমি অভাগিনী যাব প্রভুর সংহতি।।"[১৩]

(লখিন্দর দংশন পালা)

মৃত্যু সংক্রান্ত এইসব লোকবিশ্বাস কবির কাব্যে বাস্তবরূপে প্রতীয়মান হয়েছে।

গ্রাম বাংলার লোকায়ত জীবনে বিভিন্ন শুভ-অশুভ চিহ্ন সম্পর্কিত লোকাচার বা লোকবিশ্বাস প্রচলিত রয়েছে। যেমন — কোনো শুভকাজে যাত্রার সময় যদি বিড়াল পথ কাটে, তাহলে সেটা অশুভ বলে আজও অনেকে বিশ্বাস করেন। আবার শুভকাজে যাত্রার সময় কারো হাঁচি পড়লে, সেটাকেও অনেকে অশুভ চিহ্ন বলে মনে করেন। বিজয়গুপ্তের কাব্য মধ্যযুগে রচিত হলেও, তাঁর কাব্যেও এই চিত্র বর্তমান। যেমন — চাঁদ সদাগর যখন বাণিজ্যে যাত্রা করেন, সেই যাত্রার পূর্বে বিভিন্ন মাঙ্গালিক ক্রিয়াকর্ম কাব্যে পরিলক্ষিত হয়। যেমন, ব্রাহ্মণেরা বেদ পাঠ করেন হাতে ধান — দূর্বা — গঙ্গাজল নিয়ে। ঘি, মধু, দুধ ইত্যাদি সামগ্রী চাঁদের সামনে রাখা হয় চাঁদের মঙ্গল কামনায় —

"যাত্রা করি সাধু লড়ে   ব্রাহ্মণেতে বেদ পড়ে
হাতে ধান্য দূর্বা গঙ্গা জল।
ঘৃত মধু দধি খণ্ড   থুইল অমৃত ভাণ্ড
সম্মুখে থুইল নানা ফুল।।"[১৪]

(যাত্রাপাটন পালা)

এখন অমঙ্গল বা অশুভ চিহ্ন সম্পর্কিত লোকাচারের প্রসঙ্গে আসা যাক। চাঁদ যখন দক্ষিণ পাটনে যাত্রা করবেন বলে ঠিক করেন, তখন সনকা চাঁদকে বলেন, তিনি স্বপ্নে দেখেছেন — চাঁদের যাত্রাকালে ভেঙে যাচ্ছে পূর্ণঘট, শোনা যাচ্ছে শৃগালের কোলাহল, যাত্রাকালে যোগিনী সামনে থালা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, উত্তরদিকে টিকটিকি ডাকছে, ডানদিকে সাপ যাচ্ছে — এইসব নানা অমঙ্গলসূচক বিষয়। তাই সনকা চাঁদকে বলেন, "এবার পাটনে গেলে চূর্ণ হবে দর্প।"[১৫] সনকার এই উক্তির মধ্যে দিয়ে তৎকালীন লোকায়ত জীবনে প্রচলিত লোকবিশ্বাসের প্রসঙ্গ কাব্যে উঠে এসেছে।

এখন বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ কাব্যে পূজা-পার্বণ বিষয়ক লোকাচার ও লোকবিশ্বাসের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক। মনসামঙ্গল কাব্য দেবী মনসার লীলা মাহাত্ম্যমূলক কাব্য। তাই এখানে মনসা পূজার মাহাত্ম্য ও পূজা পদ্ধতির কথা আমরা পাই। যেমন, বিজয়গুপ্তের কাব্যে 'হাসন হুসন যুদ্ধ পালা'য় দেখতে পাই ব্রাহ্মণবেশী শিব মাথায় ঘট নিয়ে জুয়াখেলারত রাখালদের কাছে যান। সেখানে লাটিক নামে এক যুবক বলে —

"কোথায় চলিছ গোসাঞি কি নাম তোমার।।
কাহার ঘট এই কহ মোরে সার।"[১৬]

© Santiniketan Sahityapath

(হাসন হুসন যুদ্ধ পালা)

তখন ব্রাহ্মণবেশী শিব বলেন —

“বিপ্র বলে ঘট এই দেবী মনসার।।”[১৭]

(হাসন হুসন যুদ্ধ পালা)

এই দেবীর পূজা করলে কী ফল লাভ হয় এরপর তা ব্রাহ্মণবেশী মহাদেবের কথায় উঠে এসেছে —

“হারাইলে ধন পায় সেবায় ইহান।
ধন ধান্য সম্পদে বাড়ে সেই জন।।”[১৮]

(হাসন হুসন যুদ্ধ পালা)

এরপর লাটিক মনসা পূজা পদ্ধতির কথা ব্রাহ্মণবেশী শিবের কাছে জানতে চান। তখন শিব বলেন —

“ধূপ দীপ আন আর আতপ তণ্ডুল।
গন্ধ চন্দন আন আর নানাজাতি ফুল।।
ছাগ মহিষ বলিদান যত মনে হয়।
এই সব সজ্জা লাগে ইহার পূজায়।।”[১৯]

(হাসন হুসন যুদ্ধ পালা)।

এই ঘটনার মধ্য দিয়ে দেবী মনসার মাহাত্ম্যকথা, পূজা পদ্ধতির কথা কাব্যে উঠে এসেছে। এই পূজা পদ্ধতি, বিশ্বাস আজো সমাজে পরিলক্ষিত হয়। এর থেকে বোঝা যায়, সেদিনের সমাজের সঙ্গে আজকের সমাজের মধ্যে খুব একটা প্রভেদ ছিল না।

যাই হোক, এখন এই আলোচনার উপসংহার টানার সময় এসেছে। সবশেষে এইটুকুই বলবো বিজয়গুপ্তের কাব্যে তৎকালীন লোকায়ত জীবন বাস্তবরূপে ধরা পড়েছে। লোকায়ত জীবনে থাকা কোনো প্রসঙ্গই কবির কলমে বাদ পড়েনি। জন্ম থেকে মৃত্যু, বিবাহ থেকে গর্ভবতী রমণীকেন্দ্রিক লোকাচার — সবই কবি বিজয়গুপ্তের কাব্যে উজ্জ্বলরূপে অঙ্কিত। এক কথায় কবি বিজয়গুপ্তের ‘পদ্মাপুরাণ’ মধ্যযুগীয় বঙ্গসমাজের লোকায়ত জীবনেরই দর্পণ।

তথ্যসূত্র:

১। ‘বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস’, আশুতোষ ভট্টাচার্য, কলিকাতা বুক হাউস, ১/১ কলেজ স্কোয়র, কলকাতা, ১৩৪৬, পৃ. ১
২। ‘বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা’, প্রথম পর্যায়, ভূদেব চৌধুরী, দে’জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা, দশম সংস্করণ: অক্টোবর ২০২৩, আশ্বিন ১৪৩০, পৃ. ১৭১
৩। কবি বিজয়গুপ্তের ‘মনসামঙ্গল’, অচিন্ত্য বিশ্বাস সম্পাদিত, নিউ বইপত্র, ৭৭, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ জুলাই ২০২২, পৃ. ২৮৫
৪। ওই, পৃ. ২৮৫
৫। ওই, পৃ. ২৮৬
৬। ওই, পৃ. ২৮৮
৭। ওই, পৃ. ১৪৪
৮। ওই, পৃ. ১৪৪
৯। ওই, পৃ. ১৪৫
১০। ওই, পৃ. ১৩-১৪, (ভূমিকা অংশ দ্রষ্টব্য)
১১। ওই, পৃ. ২৩২
১২। ওই, পৃ. ৩৫০

© Santiniketan Sahityapath

১৩ । ওই, পৃ. ৩৫০
১৪ । ওই, পৃ. ২৫৭
১৫ । ওই, পৃ. ২৫৬
১৬ । ওই, পৃ. ১৭৬
১৭ । ওই, পৃ. ১৭৬
১৮ । ওই, পৃ. ১৭৬
১৯ । ওই, পৃ. ১৭৬, পৃ. ৩
১০ । ওই, পৃ. ৪
১১ । ‘বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমগ্র’, পৃ. ৮৬
১২ । ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন’, পৃ. ২২
১৩ । ওই, পৃ. ৩১
১৪ । ওই, পৃ. ৩১
১৫ । ওই, পৃ. ৫৭
১৬ । ওই, পৃ. ৫৭
১৭ । ওই, পৃ. ৩৫
১৮ । ওই, পৃ. ৪৬
১৯ । ওই, পৃ. ১১৬
২০ । ওই, পৃ. ৪২

Prantik Gabeshana Patrika

 © Santiniketan Sahityapath